নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল

দেবব্রত বিশ্বাস

অরণ্যমন প্রকাশনী

ভূ মি কা

এখানে আকাশ নীল, নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল,
ফুটে থাকে হিমশাদা— রং তার আশ্বিনের আলোর মতন।

ক্রোনোলজি অনুসারে আমার দ্বিতীয় দীর্ঘ লেখা। ইনিয়ে-বিনিয়ে লেখা। বেনিয়মে লেখা। প্রথম লেখায় 'শ্রীকান্ত' চরিত্র আসে সানন্দা পূজাবার্ষিকী ১৪২৬-এ *এখানে আকাশ নীল* নামের উপন্যাসে। বর্তমানেরটি শ্রীকান্ত'র দ্বিতীয় উপন্যাস। এই উপন্যাসে এসেছে অনেক ইন্টারেস্টিং নতুন ক্যারেক্টরেরা। সঙ্গে এসেছে পুরোনো কিছু গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রেরা। আমি খুব গুরুত্বের সাথে লিখেছি এ-লেখা কিন্তু আপনারা গুরুত্বের সাথে পড়বেন না।

উপন্যাসের শেষে শ্রীকান্ত কি নতুন কিছু'র সন্ধান পেল? তার জীবন কি আর আগের মত ভবঘুরের জীবন থাকবে?

আমাদের সবার মধ্যে একজন করে যে ভবঘুরে থাকে, শ্রীকান্ত সেই ভবঘুরের নামান্তর মাত্র। কবিতার সাথে মিলিয়ে এই উপন্যাসের নাম দিলাম *নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল*। দুটো উপন্যাস মিলে একটা কবিতার লাইন হয়ে উঠুক! পড়াশোনা, ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেওয়া, গবেষণা, নানান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজ সামলে আমার লেখালেখি জীবনে আমি বরাবর অনুসরণ করি আমার প্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদকে। গুরুকে অনুসরণ করাই যায়! ঠিক কিনা!

সেইসঙ্গে এই লেখা পৃথিবীর সমস্ত শ্রীকান্তদের অথবা সমস্ত হিমুদের...।

।। ১ ।।

চোখ মেলতেই দেখি অসাধারণ এক রোদ আমার খোলা জানলা দিয়ে বিছানায় এসে পড়েছে চৌকো হয়ে। রোদ যেন চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে আমার সারা বিছানায়। কেমন একটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে উড়ছে সেই দানা চারিদিকে। আলোর কণা। নিউটন বা আইনস্টাইন দেখলে খুবই খুশি হতেন। হাইগেনস বা ফ্রেনেল দেখলে কিন্তু মোটেও খুশি হতেন না। তাঁরা কোনো না কোনোভাবে যুক্তি-অপযুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতেনই যে আলো কখনও গুঁড়ো হতে পারে না। হতে পারে তরঙ্গ। আমার খুব ইচ্ছে করছে একদিকে নিউটন ও আইনস্টাইন আর একদিকে হাইগেনস ও ফ্রেনেলকে বসিয়ে মাঝখানে আমি জজসাহেব হয়ে বসি এবং তাঁদের এই কাজিয়ার অবসান ঘটাই। কোনো একপক্ষ ভারী হয়ে এলেই তাদের থামিয়ে দিয়ে অন্যপক্ষকে বলার সুযোগ করে দিই। তাঁরা হয়তো এরকম কথোপকথন চালাবেন—

• বাদী পক্ষ ১ (নিউটন) : শ্রীক্যান্টো, আমি বলছি, আলো হল ঠিক ছোটো ছোটো ক্রিকেট বলের মতো— পিংপং বল দেখেছ, পিংপং বল? ঠিক সেরকম। আমি এখুনি ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের অঙ্ক কষে দেখিয়ে দিতে পারি যে একটি বল যে কোণে মেঝেতে পড়ে ঠিক সেই কোণেই মেঝে থেকে ধাক্কা খেয়ে ফিরেও যায়। দেখতে চাও! চাইবে না-ই বা কেন! না-চাওয়া জ্ঞান আহরণের পক্ষে খারাপ। ঠিক কিনা!

• বিবাদী পক্ষ ১ (হাইগেনস) : আরে ধুর! শ্রীক্যান্টো, আমার দিকে তাকাও। আমি বলছি, আলো আসলে তরঙ্গ— মানে ঢেউ। না হলে ইন্টারফারেন্স, ডিফ্রাকশন, পোলারাইজেশন কেন হয়?

কও দেখি!

• বাদী পক্ষ ২ (আইনস্টাইন) : আহাহা, শোনো শ্রীক্যান্টো! আমি বলি যে, আলো যদি তরঙ্গই হয় তাহলে ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট কীভাবে হল?

• বিবাদী পক্ষ ২ (ফ্রেনেল) : (ফ্রেনেল আবার বাঙাল ভাষা বলতে শুরু করবেন) তুমরা কী যে কও! শিরিক্যান্টো, শুনো। আমি ঠিক কথাই কইছি। আলো হইল গিয়া তরঙ্গ। হক কথা কইছি। মা কালীর দিব্যি দিয়া কইছি। মিথ্যা মিথ্যা দিব্যি-টিব্যি খাইতে আমি অ্যাগ্নেরেই পসন্দ করি না কিনা!

• বাদী পক্ষ ২ (আইনস্টাইন) : আহাহা ফ্রেনেলবাবু, ওসব দিব্যি-টিব্যি দিয়ে কি আর ঘটনা বদলানো যায়! যাহা সত্য তাহাই ঘটনা। সত্য ঘটনা বা ট্রু ফ্যাক্ট বলে শুধু পৃথিবী নয়, ব্রহ্মাণ্ডেও কিছু নেই। মানে আমি আমার স্পেস-টাইম টেনসর দিয়েও সেরকম কিছু পাইনি। শুধুই ফ্যাক্ট! ইনফ্যাক্ট ফ্যাক্ট ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন। কী বলেন! জয় বাবা অ্যাসিমভ!

আমি তাঁদের সবাইকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলব, "আপনারা চুপ করুন সবাই। আলো হল আলো। জগতের অন্ধকার দূরকারক। আর কিছু নয়। কণা নয়, তরঙ্গ নয়, ঢেউ নয়, ক্রিকেট বল নয়, টেনিস বল নয়, ঝিঁঝিঁপোকা নয়, উচ্চিংড়ে নয়, গিরগিটি নয়, তেলাপোকা নয়, গুবরেপোকা নয়— কিচ্ছু নয়। এখন ফুটুন। আমি ভ্রমণে বের হব। পরিব্রাজন ছাড়া মুক্তিলাভ হয় না। আমি একজন পূর্ণ পরিব্রাজক। ভাবছি মাধুকরীবৃত্তি গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করব। মাত্র দু'ঘর গৃহস্থের বাড়ি থেকে ভিক্ষা করে সারাদিনের ক্ষুন্নিবৃত্তি করব। যান আপনারা। নমস্কার।"

এইসব মনে করে করে আমি সেই আলোর গুঁড়ো দেখতে থাকলাম। আজ খুব সুস্থ লাগছে নিজেকে। মাঝে মাঝে এমন হয়। কোনো কারণ ছাড়াই নিজেকে খুব সুস্থ লাগে। মনে হয় পৃথিবীতে কোথাও কোনো অসুবিধা নেই। সবাই খিদে পেলেই সামনে গরম ধোঁয়া-ওঠা ভাতের থালা দেখতে পাবে। কোথাও কেউ সন্ত্রাসবাদের বলি হবে না। হিন্দু-মুসলিম-শিখ-খ্রিস্টান বলে কেউ থাকবে না। সবাই হবে শুধুই মানুষ। কেউ কাঁদবে না। সারা

ভুবন জুড়ে শুধুই হাসির ছররা বয়ে যাবে। আজ সকালে এরকম কেন মনে হচ্ছে জানি না।

আমি বিছানায় উঠে বসে থাকলাম। কীরকম একটা আলস্যভাব চেপে ধরেছে। কিচ কিচ করে চড়ুইপাখি ডাকছে। চোখ তুলে দেখি যে জানলাটা দিয়ে রোদ আসছে সেটার শিকে দু'টো চড়ুইপাখি বসে তাদের মধ্যে বিচিত্র ভঙ্গিতে কথাবার্তা চালাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন মনে হয় পুরুষ, কারণ সে একটু মোটাসোটা আর কালচে। আর অপরজন একটু কম মোটাসোটা। পুরুষটি নিয়ম ভঙ্গ করে বেশিমাত্রায় কিচ কিচ করছে। আর মেয়েটি চুপ করে অন্যদিকে চেয়ে আছে মুখ উঁচু করে। তার মধ্যে অভিমানের ভাব প্রবল। কোনো ষোড়শী তার প্রথম কলেজে যাওয়ার দিন যেমন রাজহংসীর মতো গর্বিতা থাকে, তার মধ্যে ঠিক তেমনই ভাব মনে হচ্ছে। গর্বের সাথে কিছু পরিমাণে অভিমানও মিশে আছে। কিচ কিচ করতে করতে পুরুষটি আমার দিকে তাকাতে লাগল। যেন তাকে সমর্থন করি সেই আশায়। আচ্ছা, আমার আজ কী হল! এসব কী ভাবছি! পাখিদের কি সত্যিই মান-অভিমান আছে? তাদের মধ্যেও কি ঝগড়াঝাঁটি হয়? ইউনিভার্সিটির কোনো পক্ষীবিশারদকে ধরে জিজ্ঞেস করতে হবে খুব তাড়াতাড়ি।

মনের এইসব ভাব দূর করতে আমি একটা সিগারেট ধরাবার কথা ভাবতে লাগলাম। চৌকির পাশে একটিমাত্র সিগারেট পড়ে আছে। কেমন ভেজা ভেজা ভাব তার। যেন সকালের আলস্য তাকেও চেপে ধরেছে। সিগারেট ধরানোর কথা ভাবতেই মনটা আরও খুশিতে ভরে উঠল। ধরিয়ে ফেললাম। ধরিয়ে তার ধোঁয়া ছাড়তে লাগলাম। সিগারেটের ধোঁয়া সকালের রোদকে আরও গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিল। আলোর কণা আরও বড়ো হতে লাগল। ক্রিকেট বল থেকে ফুটবল। খালি পেটে সিগারেটের তিক্ত স্বাদ আর নিকোটিনের নির্যাস কেমন যেন একটা অস্থিরতার সৃষ্টি করে আমার মধ্যে। কোনোভাবেই সেই অস্থির ভাবকে আমি নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারি না। সবার ক্ষেত্রেই কি এই ভাবের সৃষ্টি হয়? ছবিতে দেখেছি সত্যজিৎ রায় খুব সিগারেট খেতেন।

তাহলে কি তাঁরও সেই ভাব হত? তিনি কীভাবে দূর করতেন সেই ভাব? না কি সেই ভাবের ঘোরেই তাঁর সব অমর সৃষ্টি তৈরি করে ফেলতেন? মনের মধ্যে এইসব নানান উচ্চপর্যায়ের চিন্তা-ভাবনা ঘুর ঘুর করছে। ভাবছি এবার প্রফেশনাল দার্শনিক হয়ে যাব একেবারে। একটা ঘর ভাড়া নিয়ে বাইরে সাইনবোর্ড আঁটিয়ে দেব। তাতে লেখা থাকবে—

দার্শনিক চিন্তাধারা প্রদান কেন্দ্র

এখানে অতি বিখ্যাত দার্শনিক দ্বারা উচ্চকোটির চিন্তাধারা প্রদান করা হইয়া থাকে। সত্বর যোগাযোগ করুন।

এইসব ভেবে ভেবে সিগারেটে মজার টান মারছি। বুক ভরে নিচ্ছি তিক্ত ধোঁয়া। অস্থিরতা বাড়ছে। আর বাড়ছে আমার অপরিষ্কার ঘরের মধ্যে নিকোটিনের কড়া গন্ধ। দেয়ালে মাকড়শাগুলো ছটফট করছে সেই ধোঁয়ায়। মর শালারা! আমি তবুও খাব সিগারেট।

চড়ুইগুলো কী করছে ভেবে তাকালাম জানলার দিকে। তাকিয়েই চমকে উঠলাম। সাতসকালে একটা উলটানো ব্রহ্মদৈত্য পাশের পেল্লাই পেয়ারাগাছের ডালে ঝুলছে। সে তার উলটানো চোখ দিয়ে আমাকে দেখছে। আমি "বাপরে বাপ" বলে চিৎকার দিতে গিয়েও দিলাম না। ঠোঁটে জ্বলতে থাকা সিগারেট আর একটু হলেই পড়ে যেত। সিগারেট থেকে আগুন-মাগুন লেগে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হত। ঠাহর করে দেখে বুঝলাম ব্রহ্মদৈত্য-ফ্রহ্মদৈত্য কেউ না। গেছো শিবু দাঁত বের করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। সামলে নিয়ে বললাম,

"এরকম বদন করে উলটো হয়ে ঝুলছিস কেন, দাঁতক্যালা? সক্কাল সক্কাল পিলে চমকে দিয়েছিলি একেবারে। গাধা কোথাকার!"

আমার কথা শুনে গেছো শিবুর দাঁত আরও চওড়া হল। সে খিক খিক করে হাসতে লাগল। উলটো হয়ে ঝুলেই সে বলল, "আজ্ঞে এর'ম করে ঝুলে থাকতে বেশ লাগে। খুবই আরাম হয়।"

এইখানে গেছো শিবুর কথা বলে নিই। পাগল শিবুর নাম কবে থেকে গেছো শিবু হল কেউ জানে না। গাছে উঠতে ওস্তাদ মানুষ সে। সেই থেকেই তার নামের আগে গেছো কথাটা লেগে

গেছে। সে এখন গ্রামে গ্রামে ঘুরে এর-তার গাছের নারকেলটা, তালটা, সুপুরিটা পেড়ে দিয়ে কিছু খাবার-দাবার জুটিয়ে থাকে। সে যাতায়াত করে এক গাছে থেকে অন্য গাছে। হনুমানের মতো লাফ দিয়ে এক গাছের ডাল থেকে অন্য গাছে চলে যায়। তাকে রাস্তায় চলাচল করতে খুব একটা দেখা যায় না। গাছেই থাকে প্রায় সারাক্ষণ। দুনিয়ার লোক গাছতলা দিয়ে যাওয়ার সময় তার পেচ্ছাপের ছোঁয়া পেয়ে ভেবেছে অকালে বৃষ্টি হচ্ছে বোধহয়। তার প্রিয় শখ হল গাছের ডালে উলটো হয়ে ঝুলে থাকা। গেছো বাদুড়ের মতো। তার গেছো উপাধির সাথে বাদুড় উপাধিও যোগ করা যায় অনায়াসে। গেছো শিবু সবার খুব প্রিয়, বিশেষ করে আমার। সে মাঝে মাঝে আমাকে কলাটা, মুলোটা, আমটা, জামটা, পেয়ারাটা, ডাবটা এনে দেয়। দিয়ে বলে,

"খান, আরাম করে খান। আপনাকে খেতে দেখলে আমার খুব ভালো লাগে। তবে এগুলো চোরাই মাল। গগনদের বাগানবাড়ির গাছ বেয়ে আসার সময় তুলে নিয়েছি কাউকে না বলে।"

আমি বলি, "বেশ করেছিস। তোর চোরাই ফলের টেস্ট কেনা ফলের টেস্টের চেয়ে অনেক বেশি। আরও আনবি। কিন্তু শুধু গগনদের বাগান থেকে আনলেই হবে? রাম, শ্যাম, যদু, মধু, অদু, বদু, গদুর বাগান কী দোষ করেছে? সবার বাগান থেকেই আনবি। সবার বাগানের ফল আমাকে টেস্ট করানোর দায়িত্ব তোর। বুঝলি!"

গেছো বলল, "আজ্ঞে আপনি যখন বলেছেন তখন আর না এনে পারি! সবার বাগান থেকে ফল এনে খাওয়াব। কিন্তু ওই অদু, বদু আর গদু নামের লোক কি এ তল্লাটে কেউ আছে? যদি থাকেও তবে তাদের কি কোনো ফলের বাগান আছে? তাই বিরাট চিন্তায় পড়ে গেলাম।"

বলে সে বিশাল চিন্তান্বিত হয়ে গেল। ঠিক যেন বিরাট একজন দার্শনিকের মতো তাকে চিন্তা করতে দেখা গেল। ভাবছি আমার 'দার্শনিক চিন্তাধারা প্রদান কেন্দ্র'-তে গেছোকে একটা পজিশন দিয়েই দেব। এরকম চিন্তা যাতে সে আরও অনেককে দিতে পারে। আমার সিগারেট শেষ হয়েছে। গেছো উলটো হয়ে

ঝুলে ঝুলেই চিন্তা করছে। আমি আরও কিছুক্ষণ তাকে দেখলাম। গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন। আমি আমার ভাঙা টেবিল থেকে নিমের ডালটা নিয়ে দাঁতন করব ভাবছি। খোকন কখন যে এই একটা করে নিমের ডাল নিয়ে এসে রাখে আমি কোনোদিন বুঝতে পারি না। সিগারেটের তিক্ততার সাথে নিমের তিক্ততা যোগ হয়ে দেখি কী স্বাদ হয়! মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় জানি। তাহলে তিক্ত তিক্ততে মিশে মিষ্টি হয়ে যাবে! নিমের ডাল মুখে পুরে দেখলাম কিছুমাত্র মিষ্টত্ব এল না মুখে। বরং আরও তিক্ত হয়ে গেল। মানুষের সবকিছুরই একটা সহ্যসীমা থাকে। সেই সীমার ঊর্ধ্বে উঠে গেলে আর কিছুই অনুভূতি হয় না। আমার এখন সেরকম অবস্থা। নিমের ডাল চেবাচ্ছি কচকচ করে। কিন্তু কেন জানি না মিষ্টি লাগছে এবার। আমার চেবানোর চোটে নিমের ডালের ডগাটা ছবি আঁকার তুলির মতো হয়ে গেছে। আচ্ছা, নিমের দাঁতন দিয়ে ছবি আঁকলে কেমন হয়! একটা এক্সিবিশন হবে যেখানে শুধুই নিমের ডালের দাঁতন দিয়ে আঁকা ছবি থাকবে। নাম হবে 'দাঁতন-শোভন' বা 'দাঁতন-চিত্র' জাতীয় কিছু একটা। আইডিয়াটা বেশ ভালো। আর্টস কলেজের কোনো ছাত্রের মাথায় এই চিন্তাধারাটা ঢুকিয়ে দিতে হবে। অবশ্যই আমার সেই 'দার্শনিক চিন্তাধারা প্রদান কেন্দ্র' থেকে তাকে এই চিন্তাটা ঢোকাতে হবে।

এসব ভাবতে ভাবতে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেছিলাম। সামনে তাকিয়ে দেখলাম খোকনের মা রাজ্যের বাসন মাজছে। তার পাশে চুপটি করে বসে আছে আমাদের পাড়ার কুকুর ভুলু। খোকনের মা তার সাথে অনর্গল কথাবার্তা চালাচ্ছে। ভুলু নির্বিকার চোখে শুনছে। জাগতিক ব্যাপারে তার তেমন আগ্রহ নেই। হয়তো কোনো জটিল বিষয় নিয়ে সে ভাবনা-চিন্তা করছে তার কুকুরিক মনে। আচ্ছা, আমার দার্শনিক চিন্তাধারা প্রদান কেন্দ্রে ভুলুকে একটা পজিশন দিলে কেমন হয়! সে টেবিলের ওপারে চশমা এঁটে গম্ভীর মুখে বসে থাকবে আর রাজ্যের লোক তাদের আদুরে, বেলেল্লা, বখাটে কুকুর এনে দার্শনিক চিন্তাধারা ঢুকিয়ে নিয়ে যাবে। খোকনের মা থালা মাজতে মাজতে বকবক করেই চলেছে,